চারণভূমি

হাসনাত আবদুল হাই

ঐতিহ্য

উ ৎ স র্গ

যোহরা বিবি ইরা

‘তুমি যে ঘরগুলো তৈরি করছ তাতে মৃতরা ঘুমাবে
তুমি যে জায়গাগুলো ধ্বংস করে দিয়েছ সেখানে আসবে মৃতরা
তাদের অতীতকে দেখবার জন্য ।
অতএব, হে অতিথিবৃন্দ
গৃহস্বামীদের জন্য কয়েকটি শূন্য আসন রেখে দাও
তারা তোমাদের পড়ে শোনাবেন—
মৃতদের সঙ্গে শান্তিচুক্তির শর্তাবলি’ ।*

—মাহমুদ দারবিশ

* মাহমুদ দারবিশের কবিতার অনুবাদ : আলম খোরশেদ

এক

পরপর কয়েকটা কর্ণবিদারী শব্দ হয়, দুই খণ্ড পাথরের আঘাতে যেমন হওয়ার কথা; অন্ধকার ফুঁড়ে জ্বলে ওঠে ক্ষীণ অগ্নিশিখা, যা নিষ্কম্প স্থির, বাতাস বহে না যেহেতু। অগ্নিশিখা ক্ষণস্থায়ী, জ্বলেই নির্বাপিত হয়, যেন নিভে যায় শিশুর জীবনপ্রদীপ জন্মের পর। আবার শব্দ হয়, এবার আরো সশব্দে, গর্জন করে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ফুঁড়ে, অগ্নিশিখা একটু দীর্ঘ হয়ে কম্পমান, থাকবার জেদে থরোথরো বেপথু যেন বা।

পশুচর্বির ভিতর কাপড়ের সলতে প্রদীপের আলো ছড়িয়ে অন্ধকারকে হুমকি দেয়, একটা খণ্ডিত বলয় তৈরি হয়, দু'পাশে, ওপরে; নিচে অন্ধকার, অন্ধকারের শেষ ভ্রুকুটি যেখানে বরফ জমাট। আপন বলয়ে প্রদীপ শিখা অবিচল, ঝঞ্ঝায় নিপতিত পালের জাহাজের নিশ্চিত বরাভয়। বন্দর নেই, হয়তো অদূরে কিংবা ঠিকানা বিলুপ্ত কিন্তু গন্তব্য সেখানে, মানচিত্র জানায়।

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে টালমাটাল জাহাজের নাবিক যেন বা যুবক, প্রদীপ জ্বালিয়ে পাথুরে দেয়ালের সামনে উঁচু প্রস্তরখণ্ডের উপরিভাগের সমতলে রেখে তিনটি পাথুরে আসনে উপবিষ্ট তিনজনের সামনে এসে দাঁড়ায়, পিছনে বর্শা হাতে সহচর। চোখ-বাঁধা, পিছনে হাতমোড়া প্রৌঢ়ের সামনে এসে দাঁড়ায় যুবক, ঘৃণা আর অবজ্ঞায় দেখে, থুতু ফেলে ধুলো-বালিময় প্রায় অদৃশ্য মেঝেতে।

প্রৌঢ়ের শরীরের উপরিভাগ নড়ে, ক্রোধ ভিতর থেকে আলোড়ন তোলে, প্রতিহিংসায় উত্তপ্ত হয়, যেন বা বিস্ফোরণের প্রস্তুতি। দেখে যুবকের চোখে-মুখে বিদ্রুপ আর ঘৃণা প্রজ্বলিত হয়, ওষ্ঠদ্বয় কেঁপে ওঠে অস্থির তরঙ্গ তুলে। প্রৌঢ় দেখে না, টের পেলেও উপেক্ষা করে

অভ্যাসের তাড়নায়, যা তার এবং তার গোত্রের মজ্জাগত, অধীনস্থ দাস-সমের দুর্বিনীত আচরণে স্তম্ভিত এখন।

যুবক অস্থির পদচারণায় গুহার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায়, মাঝে মাঝে উপবিষ্ট তিনজনের সামনে এসে দাঁড়ায়, কিছু বলতে গিয়েও বলে না, তার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপে উত্তেজনায়। বর্শা হাতে সহচর তার সহানুগমন করে, কিছু বলে তার উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করে। যুবক শুনে প্রবলভাবে মাথা নাড়ে, যেন বা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তারপর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে, সিল্যুটের মতো কেবল আউটলাইনে দেখা যায় তাকে, কায়াহীন যেন। পিছনে প্রদীপের শিখা নিষ্কম্প, যেহেতু বাতাস নেই, যেটুকু আছে পাঁচজনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ভারী। প্রদীপের আলো প্রস্তরখণ্ডে বসে থাকা তিনজনের মুখের ওপর যেটুকু দেখা যায়—আলোকিত করে রাখে; প্রৌঢ়, যুবতী এবং কিশোরের শরীরে মৃদু আলোড়ন, নড়েচড়ে বসার প্রয়াস স্পষ্ট হয়।

কিছু পর প্রায় নিঃশব্দ ঘরের বাইরে শব্দ শোনা যায়। পাঁচজনই উৎকর্ণ হয়ে শোনে। উপবিষ্ট তিনজনের মুখে আশা-নিরাশার আলো-ছায়া জেগে ওঠে যেন, দণ্ডায়মান দুইজনের চোখে শঙ্কার বিদ্যুৎ চমক এসেই ধাবমান। ভোঁতা শব্দটা বড় হয়ে ধাতব শব্দের রূপ নেয়। দণ্ডায়মান দুজন ওপরে তাকিয়ে বর্শা আর তরবারি প্রস্তুত করে রাখে, মুহূর্তেই ব্যবহারের জন্য। দেয়ালের পাশে আলো-ছায়ায় মইয়ের ধাপ দেখা যায়, ওপরে যেটা ছাদ সেখানে গোলাকার শূন্যতা এখনো নির্জন। হাতের বর্শা আর তরবারি গোলাকার শূন্যতার দিকে উঁচিয়ে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায় দুজন। উপবিষ্ট তিনজনের মুখ প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল, যদিও প্রদীপশিখা আগের মতোই স্থির দ্যুতি, হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া।

ওপরের গোলাকার শূন্য পথ দিয়ে নিচে নামে দড়িতে কাপড়ে বাঁধা পুঁটলি। ধীরে, থেমে থেমে। দেখে যুবক এবং তার সহচর সহজ ভঙ্গিতে নিশ্বাস ত্যাগ করে, শরীরের মাংসপেশি শিথিল হয়ে আসে তাদের। সহচর মইয়ের কাছে গিয়ে পুঁটলি হাতে নিয়ে দড়ির শিকা মুক্ত করার পর মৃদু ভঙ্গিতে তরঙ্গায়িত করে। সংকেত পেয়ে ওপর থেকে অদৃশ্য কেউ দড়ির শিকা তুলে নেয়। একটু পর সেই শিকা দিয়ে নিচে

নামে মাটির কলস, ওজনে ভারী আর ভঙ্গুর—যে জন্য নামে ধীরে, থেমে থেমে।

প্রৌঢ় হাতের থালার দিকে তাকিয়ে বলেন, সেই শুকনো রুটি, শুকনো মাছ! এ ছাড়া কিছু নেই?

যুবক গম্ভীর স্বরে বলে, আমরা এ-ই খাই। আমাদের নিত্যদিনের খাদ্য। তোমাদের কল্যাণে এই আমাদের পাতে জোটে।

মাংস, ভেড়া কি গরুর মাংস খাও না তোমরা? মাছ খেয়ে কি শরীরের শক্তি বাড়ে?

যুবক বলে, মাংসই তো ছিল আমাদের গোত্রের প্রধান খাদ্য। কিন্তু তোমরা চারণভূমি দখল করে আমাদের গোত্রকে উৎখাত করার পর বৈকাল হ্রদের মাছ ছাড়া আমাদের খাওয়ার আর কিছু থাকল না। আমরা বাধ্য হয়ে মাংসাশী থেকে মৎস্যভোক্তা হয়ে গেলাম। মাংস খাওয়ার কথা আমরা কেবল আগের প্রজন্মের গুরুজনের কাছ থেকে শুনেছি। তারা যখন প্রতিদিন মাংস খেতেন, সেই কথা বলেন গল্পের মতো। আমরা, পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তন্ময় হয়ে শুনি।

তারপর সে বলে, হ্যাঁ, মাংস আমরা খাই যখন অরণ্যে হঠাৎ কোনো হরিণ ধরা পড়ে। কিন্তু সে তো কালে-ভদ্রে।

প্রৌঢ় ঘৃণায় মুখ কুঁচকে বলেন, শুনি তোমরা নাকি বুনো ভল্লুক শিকার করেও খাও। কী জঘন্য!

কেউ কেউ খায়। কী করবে? শীতকালে মাংসের জন্য ক্ষিদে তীব্র হয়ে এলে, হরিণ পাওয়া না গেলে তারা ভল্লুকের মাংসই খায়। তারপর সে বলে, বিপদে পড়লে মানুষ কি মানুষের মাংস খায় না?

শুনে প্রৌঢ় আঁতকে ওঠেন। ভয়ার্ত স্বরে বলেন, কী সাংঘাতিক! তোমাদের গুরুজন এই কথা বলেন নাকি তোমাদের?

যুবক বলে, ক্ষুধা মানুষকে কতটা অমানবিক করে তুলতে পারে, তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে কখনো কখনো একথা বলেন তারা, আমাদের তো আর কোনো রূপকথা নেই।

বন্দি কিশোর বালক বলে, কেন রাজা-রানির গল্প বলেন না? ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প? এসব শোনান না তারা?

যুবক বলে, না। তারা তাতার দস্যুদের গল্প বলেন, যারা প্রায়ই আমাদের গোত্রকে আক্রমণ করে যা কিছু আছে সব নিয়ে যেত। তারা আমাদের গোত্রকে যারা নিজ ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদ করে এক কোণে ঠেলে দিয়েছে তাদের কথা বলেন।

কিশোর বলে, তাঁরা কারা? তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারোনি তোমরা?

যুবক বলে, বড় হয়ে তুমি নিজেই জানবে, তারা কারা। আমরা লড়াই করতে পারিনি এই জন্য যে, আমাদের গোত্র ছোট ছিল। আর আমরা যুদ্ধবিগ্রহে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমাদের জীবন ছিল তৃণভূমিতে মেষ পালনের, জলপাই গাছ চাষের। যুদ্ধ, রক্তপাত আমাদের স্বভাবে ছিল না।

যুবতী বলে, তোমরা যদি শান্তিপ্রিয়ই হও, তাহলে আমাদের ধরে এনে বন্দি করে রেখেছ কেন?

যুবক বলে, বাধ্য হয়ে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ বেপরোয়া হয়ে যায়। মনে করো, আমরা সেই পর্যায়ে পৌঁছেছি।

যুবতী বলে, পারবে না। মিছেই রক্তপাত করেছো। আরো রক্তপাত হবে। কী আছে তোমাদের? না লোকবল, না অস্ত্রশস্ত্র। কী দিয়ে লড়বে তুমি?

আমি তো একা নই। আমার প্রজন্মের আরো আছে। সংখ্যায় আমরা বেশি নই—এটা সত্যি। কিন্তু মনোবল দিয়ে লড়ছি আমরা। আমরা ন্যায় আর সত্যের জন্য লড়ছি।

সত্যটা কী হে? প্রৌঢ় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন।

সত্য হলো ন্যায়-অন্যায়ের চেয়ে বড়। সত্য শক্তিশালী। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রৌঢ় হেসে বলেন, কম বয়সের এই একটা সুবিধা। কোনো বাঁধাকেই বড় মনে হয় না। অসম্ভবকেও মনে হয় হাতের মুঠোয়। কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন হে। বড়ই কঠিন। মিছেই পণ্ডশ্রম করছো তোমরা আর আমাদের কষ্ট দিচ্ছ। একেবারে মিছেমিছি।

যুবক বলে, আপনার কাছে তা তো মনে হবেই। আপনি শোষক-শাসকদের একজন। ক্ষমতার মদমত্ততায় ধরাকে সরাজ্ঞান করতে

অভ্যস্ত। আমরা যারা শোষিত, অবহেলিত, নির্যাতিত—আমরা কিন্তু তেমন ভাবি না।

প্রৌঢ় বলেন, এতদিন তো ভেবে এসেছো। স্থিতাবস্থা মেনে নিয়েছো। এখন হঠাৎ ক্ষেপে গেলে কেন? কী হলো যে, অতর্কিতে হামলা করতে হবে? আমাদের ধরে আনতে হবে?

যুবক বলে, ওই যে বললাম না—দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। আমাদের অধিকার নিয়ে দাবি করার জন্য যারা ছিল তাদের অনুগত করে ফেলা হচ্ছে। এটা হয়ে গেলে আমাদের হয়ে বলার কেউ থাকবে না।

তোমাদের এই হঠকারী পদক্ষেপকে তারা সমর্থন করবে বলে মনে করছো? তোমাদের হয়ে কথা বলবে কেউ? তারপর তিনি বলেন, তোমরা যা করেছো, নিরপরাধদের হত্যা, আমাদের মতো নির্দোষদের ধরে এনে বন্দি করে রাখা। এ জন্য তোমরা কারো সমর্থন পাবে মনে করো? কেউ তোমাদের মতো অপরাধীদের পাশে এসে দাঁড়াবে?

যুবক বলে, যারা অপরাধীদের অপরাধের সুবিধাভোগী, তারা নির্দোষ হতে পারে না। সুতরাং আমরা নিরপরাধদের রক্তপাত ঘটাইনি। যারা আমাদের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হয়েছে, তাদের হাতেও রক্ত আছে। আমাদের চোখে আপনারা, যাদের ধরে এনে বন্দি করে রেখেছি, তারাও অপরাধী। কেননা, আপনারা শুধু অপরাধের সমর্থনই করে আসেননি; সেই অপরাধের সুবিধা, ফল ভোগ করছেন।

যুবতী বলে, আচ্ছা, ধরে নিলাম—আমরা নির্দোষ নই; অপরাধী। আমাদের বন্দি করে তোমাদের কী লাভ হচ্ছে?

যুবক বলে, এখনো লাভ হয়নি। হতে পারে—সেই আশা করছি।

যুবতী বলে, তিনজনকে বন্দি করে কি এমন দেন-দরবার করতে পারো তোমরা, যার জন্য ঈপ্সিত ফল পাবে?

যুবক বলে, শুধু তিনজন কেন? আরো বন্দি আছে অন্য গুহায়। তবে তোমরা তিনজন হলে মূল্যবান বন্দি।

যুবতী বলে, আমরা কি মূল্যবান ক্ষমতাসীনদের নিকটজন বলে?

অবশ্যই। এ আর বলার অপেক্ষা রাখে?—যুবক বলে।

কিশোর (চারদিক দেখে) বলে, একেই তাহলে গুহা বলে? কিন্তু আমরা গুহার মুখ দেখতে পাচ্ছি না কেন? এখন খাবার সময় আমাদের চোখ বাঁধা নেই। গুহার মুখে নিশ্চয় রোদ আছে। বাইরের সব না হলেও আকাশ দেখা যাওয়ার কথা।

যুবক বলে, এই গুহাটা অন্য রকম। বলতে পারো গুহার নিচে গুহা।

কিশোর বলে, সে কী রকম?

যুবক বলে, খুলে বলা যাবে না। তাহলে সবাই জেনে যাবে। আমাদের এটা গোপন রাখতে হচ্ছে।

কিশোর দেয়ালের কাছে মই দেখে বলে, ওপর থেকে নিচে নামার জন্য বুঝি এই মই?

যুবক বলে, তা মনে করতে পারো।

প্রৌঢ় বলেন, অনেক দিন থেকেই তাহলে তোমরা এই আক্রমণের পরিকল্পনা করেছো? গুহার ভিতরে গুহা তৈরি করতে সময় নিয়েছো।

যুবক অন্যমনস্কের মতো বলে, তাই তো মনে হয়।

যুবতী বলে, কতদিন এভাবে আটকে রাখবে আমাদের?

যুবক বলে, যতদিন আমাদের দাবি মেনে নেওয়া না হয়।

যুবতী বলে, তোমাদের দাবিটা কী?

যুবক বলে, সেটা যাদের জানানোর কথা তাদের জানানো হয়েছে।

যুবতী বলে, তারা যদি তোমাদের দাবি না মানে, তাহলে?

যুবক অবাক হয়ে বলে, অন্য বন্দিদের কথা ছেড়ে দিলাম। তোমরা তিনজন গুরুত্বের দিক দিয়ে এত মূল্যবান, তারপরও আপস করবে না? দাবি মানবে না? কী যে বলো!

মনে করো, তারা আপস করতে রাজি হলো না; আমাদের বিসর্জন দিল সামষ্টিক স্বার্থের কথা ভেবে। কিংবা নিজেদের অহমিকা খর্ব হতে না দিয়ে। তাহলে?

তাহলে, তাহলে...। যুবক হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকে যুবতীর দিকে। বোঝা যায়, এই সম্ভাবনার কথা তার মনে হয়নি। তারপর সে বলে, আমি তো মনে করেছি তোমাদের গোত্রের প্রতিটি সদস্যের জীবন তারা আমাদের গোত্রের মানুষের চেয়ে অনেক বেশি মনে করে। আর

তোমরা হলে আরো মূল্যবান, যেহেতু প্রভুর আপনজন। আমি ভাবতে পারি না ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক স্বার্থ এমন কী বড় হতে পারে, যা তোমাদের জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান?

যুবককে এরপর বেশ চিন্তিত দেখায়। সে বিড়বিড় করে কিছু বলে, যার খণ্ডাংশ শোনা যায়—স্বার্থপর, ক্ষমতাদর্পী, নিষ্ঠুর, অমানবিক, জিঘাংসায় অন্ধ। এসব শব্দ বের হয় তার মুখ দিয়ে।

খাওয়া শেষ হলে প্রৌঢ় বলেন, এই খাওয়া খেয়ে আমরা বেশিদিন বাঁচব না; বুঝলে জওয়ান? তাদের এ কথা জানাও।

যুবকের সহচর এঁটো প্লেট নিয়ে কাপড়ের পুঁটলিতে রেখে মইয়ের কাছে যেতে যেতে বলে, আমরা বেঁচে আছি কী করে? দিনের পর দিন এই তো খাই।

প্রৌঢ় হাই তুলে বলেন, তোমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। মানুষের শরীর অভ্যাসের দাস। যা সওয়াবে তা-ই সয়।

যুবকের সহচর প্লেটের পুঁটলি ওপর থেকে নিচে ঝোলানো দড়িতে বেঁধে কয়েকবার নাড়া দিয়ে ওপরে কাউকে জানায় যে, পুঁটলি তৈরি। দড়িতে বাঁধা পুঁটলি ওপরে উঠতে থাকে। সে ঘুরে প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে খেতে খেতে আপনাদেরও এই খাওয়া অভ্যাস হয়ে যাবে।

প্রৌঢ় আড়মোড়া ভেঙে বলেন, শুধু কি খাওয়া? এই যে হাত আর চোখ বাঁধা অবস্থায় সারাদিন এই শক্ত পাথরের ওপর বসে থাকা। রাতের বেলা খড়ের বিছানায় ইঁদুর আর পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে ঘুমের চেষ্টা করা। এসব সহ্য করে কি বেশি দিন টিকবে শরীর?

যুবতী বলে, দাদা বয়স্ক মানুষ। তার হাত আর চোখ না বাঁধলে হয় না? তিনি পালাতে পারবেন না।

যুবক দুজন কিছু বলার আগে প্রৌঢ় বলেন, তোমরা দুজনও পারবে না। এদের দুজনকে কাবু করে মই বেয়ে কোনো রকমে না হয় ওপরে উঠলে। তারপর দেখবে সেখানে গুহার মুখ আগলে দাঁড়িয়ে আছে আরো ক'জন। তাদের কাবু করবে কীভাবে? সুতরাং আমাদের কারো পালাবার উপায় নেই। যতক্ষণ না আমাদের সেনারা এসে মুক্ত করে অথবা এদের দাবি মেনে নেওয়া হয়। তারপর তিনি যুবকের দিকে

তাকিয়ে বলেন, হাত আর চোখ খুলে দিতে হলে আমাদের তিনজনেরই দাও। আমরা কেউ পালাতে চাইলেও পারব না।

যুবক কিছুক্ষণ চিন্তা করে। তারপর বলে, আমি একা সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তারপর সে বলে, বুঝতেই পারছেন, বন্দিদের মধ্যে আপনারা তিনজনই সবচেয়ে মূল্যবান। যদিও আমরা মনে করি, সব জীবনের মূল্য সমান।

এই সময় মইয়ের কাছে ঝুলন্ত দড়িটি ঘন ঘন নড়ে ওঠে। একটু পর দুজন যুবক মই দিয়ে দ্রুত নেমে একটা মস্ত বড় শুকিয়ে যাওয়া ঝোপ দিয়ে ওপরের গর্ত ঢেকে দেয়। তারপর নিচে নেমে মই টেনে গুহার দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখে।

প্রথম যুবক এবং তার সহচর ব্যস্ত হয়ে প্রৌঢ় আর যুবতীর মুখ বাঁধার পর ওপর থেকে নেমে আসা দুজন যুবকের একজন কিশোরের মুখও বাঁধে। একটু পর তিনজনের হাতও বাঁধা হয়। এই কাজ শেষ হলে চারজন চুপ করে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন কিছু শোনার চেষ্টা করে তারা। কিছু পর ওপরে মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কারা যেন নিজেদের মধ্যে জোরে জোরে কথা বলছে। নিচের গুহায় সেই আলাপের কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু অস্পষ্ট শোনা যায়।

প্রৌঢ় হঠাৎ জোরে চিৎকার করার চেষ্টা করেন। গোঁ-গোঁ শব্দ ঝোড়ো বাতাসের মতো শোনায়। গুহার চার দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে। প্রথম যুবক তার পিছনে গিয়ে হিংস্র হয়ে দু'হাতে গলা চেপে ধরে। প্রৌঢ়ের মুখ দিয়ে এবার ক্ষীণ স্বরে গোঁ-গোঁ শব্দ হয়। একটু পর ওপরে আর কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। পদশব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে দূরে বিলীন হয়ে যায়। তবু নিচের গুহায় চারজন যুবক উত্তেজিত উৎকণ্ঠা নিয়ে ওপরের দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

অনেকক্ষণ পর যুবকেরা কথা বলে। ওপর থেকে যে দুজন ত্রস্তে এসেছিল, তারা নিচু স্বরে নিচের গুহার দুজনকে জানায় তাতারদের একটা সন্ধানী দল তাদের পাহারাদারদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে পাহাড়ে উঠে গুহা আবিষ্কার করে ত্রস্তে এদিকে আসতে থাকে। তারা সংখ্যায় অনেক হওয়ায় গুহার ওপরে প্রহরারত দুজন আক্রমণ না করে

নিচে নেমে আসে। নামার পর সাপের খোলসসহ শুকনো ঝোপ দিয়ে নিচের গুহার গর্ত ঢেকে দেয়, যেন দেখে মনে হয় বসবাসহীন গুহা।

নিচের প্রথম যুবক তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করে। তারপর প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলে, নির্বোধের মতো কাজ করাটা তার ঠিক হয়নি। এর পর তার চোখ খুলে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। আগের মতোই কেবল খাওয়ার সময় তার মুখ খোলা হবে।

তারপর সে সঙ্গীদের বলে, আমাদের গুহার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং গোপনীয়তা নিশ্ছিদ্র প্রমাণিত হলো। কিন্তু সাবধানের মার নেই। সতর্ক হয়ে প্রহরা অব্যাহত রাখতে হবে, যেন শত্রুদের দেখলেই পাহাড়ে প্রহরারত যোদ্ধারা তাদের আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। শত্রুদের কাউকে বন্দি করতে পারলে আরো ভালো হবে। দেনদরবার করার সময় তাদের ব্যবহার করা যাবে। বন্দি বিনিময়ে তারা খুব কাজে লাগবে। জানো তো, তাদের জীবনের মূল্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, যার জন্য তাদের একজনের বিনিময়ে আমরা আমাদের দশজনের মুক্তি চাইতে পারি। হাহ! একজনের সমান দশজন– এতই সস্তা আর পলকা আমাদের জীবন! এত সামান্য মূল্য!

ওপরের দুজন যুবক যোদ্ধা চলে যায়। তাদের তূণে তীর, হাতে ধনুক। কোমরে দীর্ঘ ছুরিকা গোঁজা। তারা ওপরে ওঠার পর নিচের গুহার সঙ্গে যোগাযোগের গোলাকার স্থান থেকে শুকনো ঝোপ সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তার জন্য কোনো আলো এসে নিচের গুহার কোনো দিক উজ্জ্বলতর করে তোলে না। নিভিয়ে দেওয়া প্রদীপ আবার পাথরের চকমকি দিয়ে জ্বালে প্রথম যুবক। তার সহচর দ্বিতীয় যুবক প্রৌঢ়ের কাছে গিয়ে দেখে বলে, গলায় দাগ পড়ে গিয়েছে। বেশ শক্ত হাতে চেপে ধরেছিলে বটে ওস্তাদ। আর একটু হলেই অক্কা পেত।

শুনে যুবতী চঞ্চল হয়ে ওঠে। উদ্বিগ্ন স্বরে বলে, বুড়ো মানুষ! একটু বিবেচনা করতে পারতে। এমন নিষ্ঠুর কেন তোমরা?

শুনে প্রথম যুবক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ কোনো কথা বের হয় না তার মুখ থেকে। তারপর সে বলে, আমরা নিষ্ঠুর? তোমরা তা হলে কী? নিষ্ঠুরতা, বর্বরতায় তোমরা সবাইকে ছাড়িয়ে যাও। তোমাদের মুখে নিষ্ঠুর কথাটা মানায় না। তোমরা অমানুষ। তারপর সে

শান্ত হয়ে বলে, আমরা কোনো বন্দির ক্ষতি করতে চাই না। কিন্তু তিনি চিৎকার করার চেষ্টা করেছিলেন, যেন ওপরে তোমাদের সন্ধানী সেনারা বুঝতে পারে, নিচে গুহা রয়েছে। সেখানে মানুষ আছে। আমাদের ধরিয়ে দেবার এমন মতলব দেখে বুড়োর গলা চেপে ধরা ছাড়া আর কী উপায় ছিল? তারপর সে স্বর নামিয়ে বলে, তিনি তোমার পিতামহ। তাঁকে তুমি বলো এমন কাণ্ড যেন আর না করেন। আমরা নিষ্ঠুর হতে চাই না। নিষ্ঠুরতা আমাদের গোত্রের চরিত্রে নেই। যা আছে তোমাদের গোত্রের চরিত্রে। ধমনীর রক্তস্রোতে।

যুবতী বলে, আমাদের গোত্রের কতজনকে চেনো তুমি? কতজনকে জানো ঘনিষ্ঠভাবে? রটনা আর জনশ্রুতি থেকে অনেক গল্প তৈরি হয়। গড়পড়তা মানুষের আদল দেখে একটা বিশাল গোত্রের সকলের সম্বন্ধে উপসংহারে আসা যায় না। ভালো-মন্দ মিলিয়ে যেমন মানুষ, একই কথা বলা যায় একটা গোত্র বা জাত সম্বন্ধে। তুমি মনে হয় আমাদের গোত্র বা জাতির ভালোমানুষদের দেখোনি।

প্রথম যুবক বলে, না, দেখিনি। শুনিওনি কারো মুখে। তোমরা নিষ্ঠুরতা, অশুভের প্রতীক। তোমরা মৃত্যুর দূত। বলতে বলতে সে আবার উত্তেজিত হয়ে যায়। তারপর স্বর নামিয়ে বলে, যারা একটি গোত্র দ্বারা বঞ্চিত, নিপীড়িত, তাদের পক্ষে এত সূক্ষ্ম হিসাব করা সম্ভব না। তাদের কাছে সেই গোত্রের সবাই শত্রু। কিছুসংখ্যক যদি ব্যতিক্রম হয়েও থাকে, তাহলেও সেই গোত্রের দুর্বৃত্ত পরিচিতি কিছুমাত্র বদলায় না।

যুবতী বলে, কেন বদলায় না? বদলানো উচিত।

প্রথম যুবক বলে, এই জন্য বদলায় না, ব্যতিক্রমী যারা তারা শীর্ষ নেতাদের নীতি বদলাতে পারে না। এটা যদি মিথ্যা হতো তাহলে আমাদের গোত্রকে এমন কোণঠাসা করে রেখে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো না। আমাদের প্রতিবাদ, অধিকার আদায়ের জন্য মাঝে মাঝে যে বিদ্রোহ, সেসব এমন ঘৃণাভরে উপেক্ষা করা হতো না। কঠোরভাবে দমন করে বোঝানো হতো না– আমরা আত্মসম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার রাখি না। বলা হতো না– দখলদারদের পদানত হয়ে থাকাই আমাদের নিয়তি।

যুবতী বলে, বেশ; মেনে নিলাম—আমাদের গোত্র তোমাদের অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু তোমার গোত্রের সঙ্গে যাদের রক্তের সম্পর্ক আছে, তারা কি চেষ্টা করেছে তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তোমাদের হয়ে আমাদের গোত্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে?

যুবক বলে, প্রথম দিকে করেছে। তোমাদের কাছে হেরে গিয়ে আর করেনি। নিজেদের চারণভূমি রক্ষা করতে পেরে তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছে। হ্যাঁ, তারাও স্বার্থপরতা দেখিয়েছে। আমাদের পাশে দাঁড়ানো বোকামি মনে করেছে। আমাদের ঘৃণা তাদের প্রতিও কম না। যখন দেখা গেল, তারা তোমাদের সঙ্গে একের পর এক চুক্তি করছে; আমাদের অধিকারের কথা ভুলে তোমাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে; সেই পরিস্থিতিতে আমরা, মসাক গোত্রের নতুন প্রজন্মের যোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়লাম তোমাদের ওপর।

যুবতী বলে, কসাক, চেচেন—এরা তো খুব বড়াই করে বলেছিল, আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম মসাক গোত্রকে নিশ্চিহ্ন করা, নিজ বাসভূমি থেকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র আমরা নস্যাৎ করে দেব। তারা এখন কোথায়? তোমাদের নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর এখন আমাদের তাতার গোত্র—এই যদি মনে করো তাহলে তোমরা একা কি পারবে অস্ত্রে সজ্জিত আমাদের বিশাল সেনাবাহিনীর সঙ্গে?

যুবক বলে, সম্মুখ যুদ্ধে পারব না। কিন্তু চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে জিম্মি করে নিয়ে এসে তাদের নাস্তানাবুদ করে দিতে পারি আমরা। যেমন দিচ্ছি এখন।

তারপর সে যুবতীর কাছে এসে বলে, এই যে তোমাদের তিনজনকে নিয়ে এসে জিম্মি করে রেখেছি, এতে কি তাতার নেতার ঘুম পালায়নি? খাবার মুখে নিয়ে বিস্বাদ লাগছে না তার?

যুবতী বলে, এর জন্য সাংঘাতিক প্রতিশোধ নেবেন তিনি। এমন প্রতিশোধ যে তুমি, তোমার গোত্রের কেউ চিন্তাও করতে পারবে না। তোমরা অতর্কিতে হামলা করে খুব ভুল করেছো। এমন দুঃসাহস দেখানো খুব ভুল হয়েছে তোমাদের। এ জন্য চড়া মাশুল দিতে হবে।

যুবক শুনে উত্তেজিত হয়ে গুহার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায়। এভাবে প্রদক্ষিণ করে কিছুক্ষণ, যেন উত্তেজনা কিংবা ক্রোধের ভার

কমাতে চায়। তারপর যুবতীর কাছে এসে বলে, আমাদের কাছে তোমার গোত্রের নির্মমতা নতুন কিছু নয়। প্রায়ই তোমার গোত্রের যোদ্ধারা আমাদের যেটুকু ভূখণ্ড আছে সেখানে গিয়ে পাখি শিকারের মতো পুরুষ আর নারীদের বয়স নির্বিশেষে হত্যা করে আসে। কিশোররা তাদের দেখে ঢিল ছুড়লেও ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে দল বেঁধে গিয়ে তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে আসে। ধরে নিয়ে আসে যাকে সামনে পায় তাদের; এ তো নতুন কিছু না। জন্ম থেকেই শুনছি তোমাদের অত্যাচার, নিপীড়নের কথা। দেখেছিও বড় হয়ে; যুবতী বলে, কিন্তু এবার প্রতিশোধের মাত্রা হবে দশ গুণ কেন, একশ গুণ। আমি বাড়িয়ে বলছি না। আমি তাতার গোত্রের ভিতরের লোক। আমার জানা আছে এ পরিস্থিতিতে কী হতে পারে; কী হতে যাচ্ছে। খুব ভুল করেছো তোমরা।

যুবতী উত্তেজিত হয়ে বলে, যেন তার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছে অর্বাচীনের কথা শুনে।

ভয় দেখাচ্ছ নাকি? লাভ নেই। সব জেনেশুনেই এই লড়াইয়ে নেমেছি আমরা। আমাদের হিসাব খুব সোজা। তিলে তিলে মরার চেয়ে একবারেই মরা ভালো। ভীরু আর কাপুরুষরাই মৃত্যুর আগে বারবার মরে। আমাদের মৃত্যুভয় নেই। আমাদের পরিণতি কী হতে পারে, জেনেই আমরা এই লড়াইয়ে নেমেছি। যুবকের কথায় ক্রোধ ঝরে পড়ে।

প্রৌঢ় মাথা নিচু করে ছিলেন, যেন বা তন্দ্রায়। হঠাৎ তার মুখ থেকে ঘর-ঘর শব্দ শোনা গেল। যুবতী শঙ্কিত হয়ে তাকাল তার দিকে। তারপর অনুনয়ের ভঙ্গিতে প্রথম যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখ তো ভাই কী হয়েছে দাদুর। মনে হচ্ছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

যুবক কিছুক্ষণ ভেবে প্রৌঢ়ের দিকে এগিয়ে গেল। তার মাথা তুলে ধরল আলতো করে। তারপর যুবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, জ্বর এসেছে মনে হচ্ছে। মুখ গরম। বলে সে হাত দিয়ে প্রৌঢ়ের গলা, বুক দেখে।

হ্যাঁ, জ্বর এসেছে। এখন খুব বেশি না, কিন্তু বাড়তে পারে। যুবক নিশ্চিত হয়ে বলে।

যুবতী রাগের সঙ্গে বলে, অমন করে গলা চেপে ধরে তুমিই দাদুর জ্বর নিয়ে এসেছো। তুমি নিষ্ঠুর। একটুও মায়া-দয়া নেই। তুমি, তুমি অমানুষ।

তাকে উত্তেজিত দেখায়।

শুনে প্রথম যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, চোপ। মুখ সামলে কথা বলো। তোমার মুখে 'নিষ্ঠুর' কথাটা মানায় না। তোমার গোত্রের কারো মুখে মানায় বলে মনে হয় না।

তারপর সে প্রৌঢ়ের চোখ আর হাত খুলে দিয়ে সহচর যুবককে বলে, এসো, ধরো। ইনাকে বিছানায় শুইয়ে দিই।

দুজন প্রায় অচেতন প্রৌঢ়কে দুই হাতে উঁচু করে ধরে গুহার মেঝেতে পাতা খড়ের বিছানায় শুইয়ে দেয়। তারপর চোখ বাঁধা কাপড় খুলে নেয়।

যুবতী বলে, শুইয়ে দিয়ে ভালো করেছো। শরীর কাঁপুনি দিচ্ছে কি?

প্রথম যুবক বলে, একটু একটু।

বলে সে প্রৌঢ়ের দিকে তাকায়। তার শরীর কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। তারপর গুহার কোণে রাখা খড়ের গাদা থেকে দুই হাতে খড় তুলে প্রৌঢ়ের শরীরের ওপর বিছিয়ে দেয়।

যুবতীর চোখ বাঁধা। সে বলে ওঠে, আমি কি তার পাশে গিয়ে বসতে পারি?

প্রথম যুবক তার সহচরের দিকে তাকায়। তারপর তাকে বলে, ওর চোখ খুলে দাও। সে এসে বসুক তার পিতামহের পাশে।

কিশোর চুপচাপ বসে ছিল। সে যুবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, মা, আমি কি আসব তোমার কাছে?

শুনে যুবতী প্রথম যুবকের দিকে তাকাল। তার চোখে নীরব মিনতি।

যুবক তার সহচরকে বলল, যাক। সেও বসতে পারে পাশে। অসুবিধা নেই। এখন গুহার কাছে শত্রুদের কেউ আসবে না। তারা দেখে গেছে; এখানে কেউ নেই।

বলে সে প্রৌঢ়ের পরিত্যক্ত প্রস্তরখণ্ডের ওপর গিয়ে বসে। তারপর বলে, বুড়ো শক্ পেয়েছে। আমি বেশ জোরে তার গলা চেপে